নিউজলেটার

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা-এর বুলেটিন

৪৪তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

নভেম্বর-২০২১-ফেব্রুয়ারি ২০২২

রবিউস সানী-রজব ১৪৪৩ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

নূর হোসেন মজিদী
আবদুল মুকীত চৌধুরী
ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
মোহাম্মদ আশিফুর রহমান
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
ড. আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
ড. মোহাম্মদ সামিউল হক

نیوزلتر بزرگسالان

نشریه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا

سال ۴۴، شماره ۱، نوامبر - ۲۰۲۱ —فوریه ۲۰۲۲

آبان- آذر- دی- بهمن ۱۴۰۰

مدیر مسؤول وسردبیر :

دکتر سید حسن صحت
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا

اعضای هیئت تحریریه :

نور حسین مجیدی
عبد المقیت چودری
دکتر سید حسن صحت
محمد آصف الرحمن
محمد سعید الاسلام
دکتر عبد القدوس بادشاه
دکتر محمد سمیع الحق

মুদ্রণ : মাল্টি লিংক প্রিন্টার্স

৬৮, ফকিরাপুল, ইসলাম ভবন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

ফোন : ৭১৯১৮১৮, উ-সধরষ : সঁষঃরষরহশঢ়@মসধরষ.পড়স

''যতদিন পর্যন্ত না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।'' -ইমাম খোমেইনী (রহ.)

সূচিপত্র

- ❖ **স্মরণীয় বাণী** ⏭ ০২
- ❖ **সম্পাদকীয়**
  - ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ⏭ ০৩
- ❖ **আদর্শ** ⏭ ০৪-২৭
  - উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব ও মুসলিম সমাজ ⏭ ০৪-০৬
  - নববী জ্ঞানের তোরণ আলী ইবনে আবি তালিব ⏭ ০৭-১০
  - নবীকন্যা হযরত ফাতেমা (সা. আ.) এর পবিত্র জন্মদিন এবং বিশ্ব নারী দিবস ⏭ ১১-১৩
- ❖ **ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান** ⏭ ০৪-২৭
  - ইমাম খোমেইনী (র.) ও ইরানের ইসলামি বিপ্লব ⏭ ১৪-১৭
  - ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট এবং প্রভাব ⏭ ১৮-২১
  - শহীদ কাসেম সোলাইমানি : অন্তহীন এক বীরের মহান কীর্তি ⏭ ২২-২৫
  - ইসলামি বিপ্লবের ৪৩ বছর, অবরোধ সত্ত্বেও যেভাবে এগিয়ে চলেছে ইরান ⏭ ২৬-৩৪
  - 'শাবে ইয়ালদা' ইরানের শীতকালীন জনপ্রিয় উৎসব ⏭ ৩৫-৩৬
- ❖ **স্মরণীয় দিবস** ⏭ ৩৭

কিশোর নিউজলেটার সূচিপত্র

- ❖ **সাহিত্য** ⏭ ৫৯-৬৪
  - শিশু-কিশোরদের জন্য মহান আল্লাহর পরিচয় ⏭ ৩৮
  - ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব ⏭ ৩৯-৪১
  - কিশোর-তরুণদের উপর মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর প্রভাব ⏭ ৪২-৪৪
  - গল্প : পণ্ডিত বোযর্গমেহের ⏭ ৪৫

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা

বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬১১৮৬৪, ৯৬১১৯৮৭

উ-সধরষ : ফযধশধ.রপৎড়@মসধরষ.পড়স

স্মরণীয় বাণী

- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এলো এবং বলল : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে নসীহত্ করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন : 'আমি যদি তোমাকে নসিহত্ করি তা মেনে চলবে তো?' লোকটি তিনবারই জবাব দিল: 'জ্বী, হে আল্লাহ্র রাসূল!' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করলেন : তোমাকে নসিহত করছি যে, যখনই তুমি কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে তখনি কাজটির পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা ও পর্যালোচনা করবে; কাজটা যদি উন্নতি ও হেদায়াতের উৎস হয়ে থাকে তাহলে তা আঞ্জাম দাও, আর তা যদি গোমরাহীর উৎস হয়ে থাকে তাহলে তা বর্জন করো।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'হয় আলেম হও, নয়তো 'ইল্ম্ অর্জনে রত হও; কিন্তু স্বীয় সময়কে অযথা কাজে ও ভোগ-আনন্দে ব্যয় করো না।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'তোমাদের শিশুদেরকে সর্বপ্রথম যে শব্দাবলি শিক্ষা দেবে তা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।'
- হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এরশাদ করেন : 'হে আলী! তোমার খাবারের শুরু ও শেষ যেন হয় লবণ। কারণ, লবণ সত্তরটি রোগ নিরাময় করে, যার মধ্যে ন্যূনতম হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ ও দাদ।'
- আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'জেনে রেখ, কোরআনের তেলাওয়াতে যদি চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা না থাকে তাহলে তাতে কোনোই লাভ নেই।'
- হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'তোমরা যদি সাফল্য কামনা করো তাহলে দৃঢ়তার সাথে কর্মপ্রচেষ্টা অবলম্বন করো।'
- আমীরুল্ মু'মিনীন্ হযরত আলী (আ.) এরশাদ করেন : 'যে কেউ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার খায়, ভালো করে চিবিয়ে খায়, পুরোপুরি তৃপ্ত হবার আগেই খাওয়া বন্ধ করে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ হলে বিলম্ব করে না, মৃত্যু ছাড়া সে অসুস্থ হবে না।'
- এক ব্যক্তি হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.)-এর কাছে আরয করল : 'আমি হাতের কাজ (শিল্পকর্ম) পারি না এবং ব্যবসায়ের কাজও ভালো জানি না। তাই আমি এখন মাহ্রূম ও মুখাপেক্ষী।' তখন হযরত ইমাম এরশাদ করেন : লোকদের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য তুমি শ্রমিকের কাজ করো এবং নিজের মাথায় করে বোঝা বহন করো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও কাঁধে করে একটি পাথর বহন করেন এবং তা তাঁর বাগানের একটি দেয়াল তৈরির কাজে ব্যবহার করেন; সে পাথরটি এখনো সেখানে আছে।'
- হযরত ইমাম মূসা কাযেম্ (আ.) এরশাদ করেন : 'এমন কোনো ওষুধ নেই যা কোনো না কোনো ব্যথাকে উস্কে না দেয়। তাই যতক্ষণ সম্ভব ওষুধ সেবন পরিহার করো, কারণ, এটাই শরীরের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।'
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'মঙ্গলবার নখ কাট, বুধবার হাম্মাম করো এবং হাজামতের প্রয়োজন হলে তা বৃহস্পতিবারে আঞ্জাম দাও। আর জুমুআর দিন সর্বোত্তম খুশবু দ্বারা নিজেকে সুগন্ধময় করো।
- হযরত ইমাম রেযা (আ.) এরশাদ করেন : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মদকে এ কারণে হারাম করেছেন যে, তা পানকারীদের বিচারবুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়।'

(মাফাতীহুল্ হায়াত্ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)
অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষকের স্বীকারোক্তি অনুসারে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়া বিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা হিসাবে আখ্যা লাভ করেছে।

এই বিপ্লবের গুরুত্ব পর্যালোচনার জন্য আমরা ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে বিশ্বের বড় বড় বিপ্লব, যেমন : ফরাসি বিপ্লব, রুশ কিংবা চীনের বিপ্লবের সাথেও তুলনা করে দেখতে পারি। আবার এই বিপ্লবের অর্জনসমূহের দিক থেকেও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

উভয় পদ্ধতিতে আমরা এই ফলাফলে উপনীত হব যে, তিনটি বৈশিষ্ট্য এই বিপ্লবকে বিশ্বের অন্য সব বিপ্লব থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। তা হলো 'ইসলামি হওয়া', 'জনতার বিপ্লব হওয়া' এবং 'সাংস্কৃতিক দিকের প্রাবল্য'। যে বিপ্লব বিপুল জনগণের অংশগ্রহণে বিজয় লাভ করেছে এবং একই সাথে 'অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদ' এবং 'বাইরের সাম্রাজ্যবাদ'কে টার্গেটে পরিণত করেছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেছে যে, ইসলামের নামে এবং দ্বীনে ইসলামের মাধ্যমেও সবচেয়ে একনায়কতান্ত্রিক ও খোদাদ্রোহী নেতাদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো এবং তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে টেনে নামানো যায়। আর তদস্থলে জনগণের পছন্দের সরকারকে স্থলাভিষিক্ত করা যায়। আর ঠিক এই কারণেই তাত্ত্বিকরা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পিছনের কারণ ও পূর্ব শর্তাবলি নিয়ে যেসব তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন, সেসব তত্ত্বের বিপরীতে ইরানের ইসলামি বিপ্লব তাদের বিপ্লবতত্ত্বের বই-কিতাবে বিশ্লেষণের নতুন এক পৃষ্ঠা যোগ করে দেয়।

এই বিপ্লব তার স্লোগানসমূহ, যেমন : 'স্বাধীনতা, মুক্তি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র' কিংবা 'প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য নয়, ইসলামি প্রজাতন্ত্র' এই স্লোগান সহকারেই বিশ্বমঞ্চে পরিচিতি লাভ করেছে। আর বৈশ্বিক অঙ্গনে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সামনে খোদায়ী মূল্যবোধসমৃদ্ধ জনমানুষের জাগরণভিত্তিক বিপ্লবের একটি মডেল উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

ইরানি জাতির বিপ্লব ছিল 'ঈমান এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধভিত্তিক' একটি বিপ্লব। আর এটাই এই বিপ্লবকে ফরাসি কিংবা রুশ বিপ্লব থেকে পৃথককারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে গণ্য হয়।

অবশ্য এই আন্দোলন ইরানের সমকালীন ইতিহাসের দীর্ঘ স্বাধীনতাকামী আন্দোলনসমূহ, যেমন : সাংবিধানিক আন্দোলন, তেলসম্পদ জাতীয়করণ আন্দোলন এবং বিভিন্ন ন্যায়কামী সংগ্রামের ধারায় এসে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। অতঃপর একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে মুসলমি জাহানের রাজনৈতিক হাওয়া বদলের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

অপরদিকে 'ধর্মীয় নেতৃত্বের উপাদান'টি ছিল ইসলামি বিপ্লবের আরেকটি বিশেষ দিক। এই বিপ্লব সূচিত হয় একজন মুসলমান ফকিহ ও দ্বীনি আলেমের নেতৃত্বে। ইরানি জাতির ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকলে দেখা যেত কেবল রাজা-বাদশাহরাই ইরানে শাসন করত। আপনি যদি হাফিয, সাদি, ফেরদৌসিসহ ইরানের নামজাদা কবিদের কবিতা পাঠ করেন তাহলে ইরানে বাদশা ও সুলতানদের কী ভূমিকা ছিল তা বুঝতে পারবেন।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব প্রথমবারের মতো ইরানের শাসনব্যবস্থা ও জাতির ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকে রাজা-বাদশাহদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং দ্বীনি আলেমদের হাতে সোপর্দ করে। আর এরূপ ঘটনা ইসলামি জাহানে তো বটেই, গোটা বিশ্বেও একটি নজিরবিহীন ঘটনা। অবশ্য বিশ্বের মুসলমানদের কাছে এই বিপ্লব যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তদ্রূপ এই বিপ্লব নিয়ে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণও কম হয়নি।

বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বার্তা ছিল ঐক্যের বার্তা। যে ঐক্য মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ থেকে দূরে রাখতে পারে। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বার্তা ছিল এটা যে, ইসলাম একটি শক্তিশালী এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী দ্বীন হিসেবে শান্তি সংহতির পথে চলার এবং মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক চাহিদাগুলো পূরণ করার সক্ষমতা রাখে।

ইসলামি বিপ্লবের বার্তাই ছিল এটা যে ইসলাম মানবের জন্য জীবনসঞ্চারী হতে পারে। ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষের সৌভাগ্য, সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। এই বিপ্লব 'আমরা পারব' এই সংস্কৃতিকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। আর ইরান এবং ইরানি জাতির মাধ্যমে এমন এক ব্র্যান্ড তৈরি করেছে যে, হ্যা, যদি কোনো জাতি ইচ্ছা করে তাহলে কয়েক শতক ধরে শাসন করে আসা এক বাদশাহিকেও উৎখাত করে তাদের কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দসই শাসনব্যবস্থাকে ক্ষমতায় আনতে পারে এবং সকল খাতে তাদের সেই পছন্দসই হুকুমতকে সমর্থন যোগাতে পারে। হোক সেটা নির্বাচন, হোক যুদ্ধ, হোক নিষেধাজ্ঞা কিংবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ যাই হোক না কেন। তারা তাদের ইসলামি বিপ্লবের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই বিপ্লব ইরানি জাতির সেই অমিত শক্তিকে বিশ্বের সামনে দেখিয়ে দিয়েছে।

ইরানের মুসলিম জাতি মসজিদগুলোকে সামাজিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। যে সামাজিক যোগাযোগ আজকে সোশ্যাল মিডিয়া জগতে খুবই পরিচিত। আমরা এবং আপনারা প্রতিদিন এসব সোশ্যাল মিডিয়া হরহামেশাই ব্যবহার করছি। যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু ইরানি জাতি আজ থেকে ৪২ বছর আগেই বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে অবস্থিত মসজিদগুলোকেই এরকম সোশ্যাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আর এভাবেই তারা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বৃহৎ বিপ্লবকে সফল করে তোলে।

আমি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর রূহের প্রতি সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ইরানের ইসলামি বিপ্লব তাঁরই নামে এবং তাঁরই স্মরণ সহকারে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

ড. সাইয়্যেদ হাসান সেহাত
কালচালার কাউন্সেলর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইং

উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব ও মুসলিম সমাজ

মুজতাহিদ ফারুকী

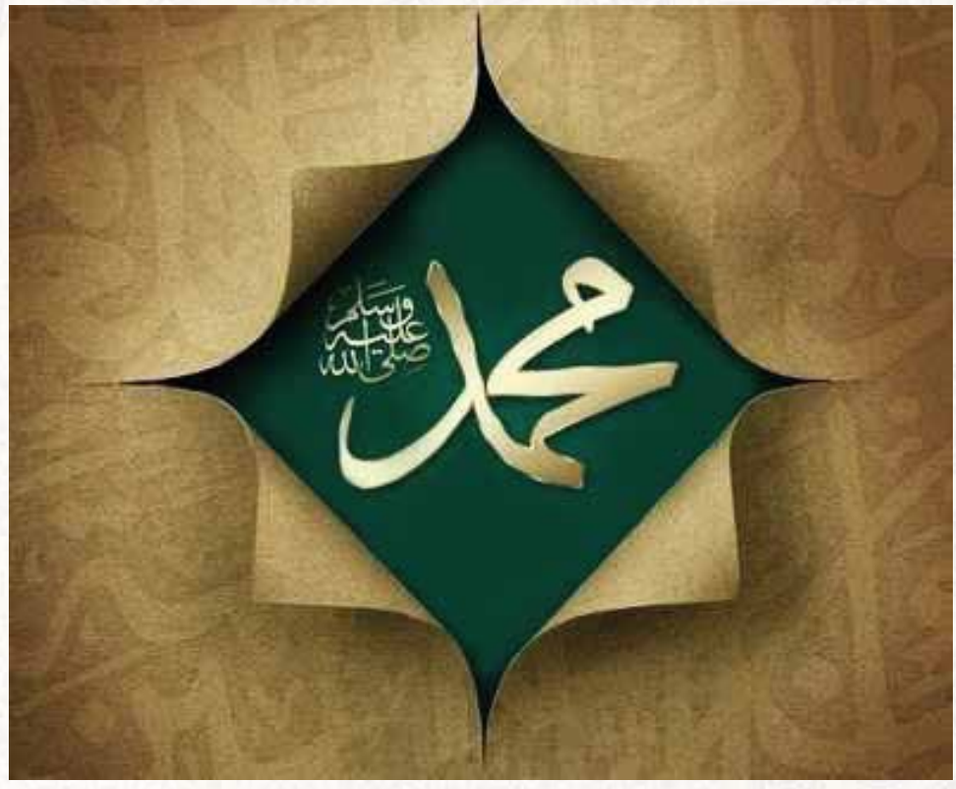

বাংলাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব মাত্র দুটি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। এর বাইরে এমন আর কোনও উৎসব নেই যেখানে মত পথ, রাজনীতি, শিক্ষা, নির্বিশেষে সব শ্রেণির বা ঘরানার মুসলমান এক হয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারেন। শবে বরাতের মতো ধর্মীয় সামাজিক উৎসব এখন আর সেভাবে পালিত হয় না। অতি ধর্মীয় শুদ্ধতার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে আমরা এই দিবস পালন নিরুৎসাহিত করেছি। কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি, এই উৎসব পালনের দিনে মহল্লার প্রতিটি ঘরে রুটি-হালুয়া বা রুটি-গোশত বিতরণের মধ্যে যে সামাজিক বন্ধন, সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হতো, গরীবের জন্য যে দান-ধ্যানের সুযোগটা ছিল তার সবই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সারা রাত ইবাদত করা ও ফজরের নামাজের পর আখেরি মোনাজাত, সিরনি বিতরণ এই সংস্কৃতিগুলো আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি হারিয়েছে সেটি হলো, মুসলমান সমাজের একটি সর্বজনীন উৎসবের আমেজ। এই আমেজটি কেবল দুই ঈদের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের ভেতর ঠিক যেন পাওয়া যায় না।

উৎসবের আমেজের লোভেই মুসলিম ছেলেমেয়েরা অন্য ধর্মের উৎসবে যোগ দিতে যায়। এজন্যই শবে বরাতের মতো উৎসবের প্রয়োজন ছিল। এটি বন্ধ হওয়ায় কী ক্ষতি হয়েছে, যারা বুঝতে অক্ষম তাদের সঙ্গে তর্কে যাব না। তবে এটুকু বলা দরকার মনে করি যে, ধর্মকে অবলম্বন করে যে কোনও উৎসব আয়োজন করা হয় পরিচ্ছন্ন বিনোদন ও সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য। এটাকে আক্ষরিক অর্থে ইবাদত হিসেবে গণ্য করার আবশ্যকতাও নেই। পরিচ্ছন্ন বিনোদন ও সংস্কৃতির উপস্থিতি না থাকলে সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে দেখি, উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব কী?

উৎসব হলো যে কোনও জাতির বা জনগোষ্ঠীর গৌরবময় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রচলিত রীতিপ্রথার সামষ্টিক উদ্‌যাপনের একটি সরব উপায়। পরস্পরের চিন্তা-চেতনাকে একটি বিশেষ আনন্দের উৎসের সঙ্গে একাত্ম করে তোলার মাধ্যমে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মুহূর্ত নিয়ে আসে উৎসব। এক অর্থে যে কোনও সমাজের সব উৎসবই হলো কোনও না কোনওভাবে সাংস্কৃতিক উৎসবই। উৎসবের অর্থনৈতিক গুরুত্বও বিপুল।

উৎসব সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় করে, সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের একটি অবস্থান আছে এই বোধ নিশ্চিত করে। বিনোদনের পাশাপাশি এটি জনগণের সামষ্টিক আচরণের একটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্থান চিহ্নিত করে দেয়। প্রতিটি উৎসবের সময় সমাজের সবার মধ্যে একটি ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বৈরিতা ভুলে পরস্পরকে আলিঙ্গনের আবহ তৈরি হয়। এতে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের একটি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উৎসব মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তার উৎস বা শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং সেটি ধরে রাখার বিপুল অনুপ্রেরণা যোগায়। দৈনন্দিন জীবনের সব রকম চাপ ও একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করে, মানুষকে কিছু সময়ের জন্য স্বস্তিকর এক নির্মল আনন্দে মেতে থাকার সুযোগ করে দেয় যা তার কর্মজীবনে ইতিবাচক ফল দেয়। আমরা যখন পরিবার, বন্ধু বা সমাজের সদস্য হিসাবে একত্রিত হই,

আনন্দময় সময় কাটাই তখন আমাদের মধ্যে ঐক্যবোধের জন্ম হয়। আর এই ঐক্য বা সংহতি হলো জীবনের, বলা যায়, সমাজের বা রাষ্ট্রের যে কোন সঙ্কট মোকাবেলা করার ও তা কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

মুসলমানদের ঈদ, খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার, ইরানিদের নওরোজ ও শবে ইয়ালদা, হিন্দুদের দুর্গা পূজা বা দিওয়ালী, নবরাত্রি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবই হোক আর লৌকিক ঐতিহ্যনির্ভর উৎসব অনুষ্ঠানই হোক এর সবগুলোই কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমাজের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। কারণ, একটি দেশের বা সমাজের সব মানুষ যে কর্মকাণ্ড বছরের পর বছর ধরে অনুশীলন করে সেটাই তার সংস্কৃতি। যেভাবে সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায় পোশাক, ধর্মীয় আচার-আচরণ, কৃষি বা বাণিজ্যের মত পেশা, ভাষা এবং ভাষাভিত্তিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। যেমন, প্রতি ভোরে নামাজ পড়ে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ঈদে কুরবানি করা, রোজা রাখা, রাতের শেষভাগে ঘুম থেকে উঠে সেহরি ও সূর্যাস্তের সময় ইফতার খাওয়া এগুলো ধর্মীয় নির্দেশে করা হলেও হাজার বছরের অনুশীলনে মুসলমানের সামাজিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু এই দিনে পরস্পরকে উপহার দেওয়া, শুভেচ্ছা জানানো, টার্কি দিয়ে ডিনারের আয়োজন এগুলো সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে গেছে। ফলে এসব এখন সংস্কৃতির অংশ, যা একইসঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

খ্রিস্টানদের পয়গম্বর যিশুর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর কিনা তা নিয়ে তাদেরই বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ভিন্নমত আছে। কিন্তু ভিন্নমত পোষণকারীরা এই নিয়ে কোনও যুদ্ধ-ফাসাদে লিপ্ত হয়নি। নিজের ভিন্নমত নিজের কাছে রেখে বৃহত্তর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে উৎসব পালন করছে। একারণেই ক্রিসমাস বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ভিন্ন ধর্মের মানুষেরাও এই দিনে বন্ধুদের সঙ্গে কার্ড বিনিময় করেন, শুভেচ্ছা জানান, সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। পার্টিতে যোগ দেন।

ইরানের নওরোজ উৎসবের কথা আমরা সবাই জানি। দেশটিতে ইসলামি বিপ্লবের পরও সেটি নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং এটি ইসলামের আবহে নতুন মাত্রা পেয়েছে। নববর্ষের প্রারম্ভে তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যাতে বছরটি তাদের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে। তারা এই প্রার্থনায় বলে থাকে : 'হে অন্তর ও দৃষ্টির পরিবর্তনকারী এবং দিন ও রাতের পরিচালনাকারী এবং অবস্থার পরিবর্তনকারী (মহান আল্লাহ)! আমাদের অবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রূপান্তরিত করুন।' নওরোজে যে দস্তরখানা পাতা হয় সেখানেও তারা কোরআন মজীদকে স্থাপন করেছে। প্রাচীন এ উৎসবকে তারা এভাবে ইসলামের আবরণে মুড়িয়ে দিয়েছে। তারা পালন করছে 'শবে ইয়ালদা'র মতো নিছকই লোকজ বিশ্বাসভিত্তিক প্রাচীন উৎসবও। এই উৎসবগুলোকে তারা ইসলামের রংয়ে রঙ্গিন করেছে। উৎসবগুলো ইরান ও আশেপাশের বেশ কয়েকটি দেশে এখনও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

বাংলা নববর্ষও হতে পারে একটি পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব। যেমন- নৌকা বাইচের আয়োজন, পিঠা উৎসব, হালখাতা, সিরনি বিতরণ ইত্যাদি নানা আনুষ্ঠানিকতায় পালিত হতে পারে বর্ষবরণের আয়োজন।

উৎসবে একটি সমাজের সব মানুষের মেলামেশা ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। ইসলামে দুটি ঈদ উৎসবের বাইরে এমন আর একটিও সুযোগ নেই যেখানে সারা দেশের মানুষ একসঙ্গে নির্মল আনন্দময় আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে পারে। আমরা সচেতন যে, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ভুলে গিয়ে কোনওরকম কর্মকাণ্ডেই বুঁদ হয়ে থাকার অনুমতি দেয়নি। এমনকি বৈষয়িকতা ভুলে কেবল খোদার অন্বেষণে বৈরাগ্য গ্রহণের সুযোগও ইসলামে নেই। বরং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের তাগিদ দেয় ইসলাম। সুতরাং ইসলাম অনুসরণ করা মানে আনন্দ উল্লাসহীন একটি নিরানন্দ জীবন কাটানো হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে এটিই যেন নির্ধারিত।

আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করা যেতে পারে কেবলই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে। আর সেই হাতিয়ারটি হতে হবে উন্নততর। আমরা মুসলমানরা অন্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে কম্পমান হবার পরিবর্তে নিজেরা আরো উন্নত সংস্কৃতির চর্চা করতে পারি কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। সংস্কৃতি যে মুসলিম তরুণদের পাশাপাশি অন্যদেরও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মদিনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন করা হয়ে থাকে। এই দিবসকে ঘিরে একটি আনন্দ উৎসবের, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব। এ দিনে রাসূলের জীবন নিয়ে আলোচনা, দোয়া- মোনাজাত, খাবার বিতরণ করা যেতে পারে। করা যেতে পারে মানুষে মানুষে শুভেচ্ছা বিনিময়, কাব্যপাঠ, কাওয়ালি ও গজলের আসর বসানো, বিশ্বের সব মানুষের মঙ্গল কামনার একটি উপলক্ষ সৃষ্টি করা। কারণ, রাসূল (সা.) তো শুধু মুসলমানের সম্পদ নন। তাঁকে বলা হয়, রাহমাতুল্লিল আলামিন।

এতক্ষণ যা কিছু বলার চেষ্টা করেছি তার লক্ষ্য একটিই। আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় চেতনা সামাজিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কাওয়ালি ইসলামি সংস্কৃতির ঐতিহ্য এমনটা সর্বাংশে ঠিক নয়। তবে এটি যে মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ তাতে সন্দেহ নেই। বেদাত বা ইসলামি চেতনার সঙ্গে ঠিক যায় না, এ কথা বলে যদি সব উৎসব আনন্দ জনজীবন থেকে হটিয়ে দিই তাহলে ক্ষতিটা কোথায় আশা করি স্পষ্ট করতে পেরেছি।

আমাদের বিশ্বাস, 'কুন ফা ইয়া কুন' অথবা 'তাজদারে হারাম' এর মতো সহিহ ইসলামি ভাবাদর্শের বাহক যেসব কাওয়ালি বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে সেগুলো গেয়ে বা শুনে যে তরুণ আবিষ্ট হয়ে থাকবে, সে আর যাই হোক কখনও বিপথগামী হবে না। এই হাতিয়ারটিকে শাণিত করে তা কাজে লাগাতে হবে। আর সেটি যদি করা হয় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বা শবে বরাতের মতো কোনও ধর্মীয় উৎসবের অনুষঙ্গে তাহলে সেটিই হবে মোক্ষম।

যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা মুসলমানদের বর্তমান করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন এই লেখা তাঁদের উদ্দেশে। বিতর্ক সৃষ্টির কোনও ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য কোনওটাই নেই।

১৩ রজব আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ

নববী জ্ঞানের তোরণ আলী ইবনে আবি তালিব

ড. এম আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন ৩০ আমুল ফিল তথা হস্তিসনের ১৩ রজব পবিত্র মক্কায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, মানব জাতির ইতিহাসে যার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরবর্তীকালেও যার কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সেদিন হযরত আলী (কা.) খানা কা'বার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হযরত আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। যিনি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা। আর মাতা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম। সুতরাং হযরত আলী পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক থেকে হাশিমী বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রধান লকবগুলো ছিল 'আসাদুল্লাহ', 'মুরতাযা' ও 'আমিরুল মুমিনীন' আর প্রধান কুনিয়াত ছিল 'আবুল হাসান' ও 'আবু তুরাব'।

হযরত আলীর কা'বা ঘরের মধ্যে জন্মগ্রহণের ঘটনাটি ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ ফযিলত। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে 'ইলমুল আনসাব' শাস্ত্রের পণ্ডিতবৃন্দ তাঁদের গ্রন্থাবলিতে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ মালেকি বলেন : 'তিনি ৩০ আমুল ফিলের ১৩ রজব রোজ শুক্রবার পবিত্র মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহ'র মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন... তাঁর আগে কেউই বায়তুল হারামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেনি। এটি এমন একটি বিশেষ ফযিলত যা মহান আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন তাঁর উচ্চতর মর্যাদাকে সমুন্নত করতে এবং তাঁর কারামাত তথা সম্মানকে প্রকাশ করতে।'

হাকেম নিশাবুরি বলেন : হযরত আলী খানা কা'বার মধ্যে জন্মগ্রহণের খবরটি তাওয়াতুর সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অদ্যাবধি আর কেউ এই বিরল মর্যাদা লাভ করেনি।

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (কা.) এরূপ অসংখ্য বিরল ফযিলতের অধিকারী ছিলেন। কবি আবুল আইনা'র ভাষায় বলতে হয় : 'আমি যদি আপনার ফাযায়েল বর্ণনা করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা এমন হবে যেন সূর্যের আলোয় ঝলমলে দুপুরে আমি দিনের পরিচয় বর্ণনা করতে চাই, যা কারও সামনে অপ্রকাশিত নয়।'

হযরত আলীর এই অশেষ ফযিলতের মধ্যে তাঁর জ্ঞান-গরিমার মহিমা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) আলীর শৈশবকাল থেকে মা যেমন বুকের দুধ পান করিয়ে তিলে তিলে আপন শিশুকে বড় করে, ঠিক সেভাবেই আলীকে জ্ঞানের আহার দিয়ে লালন পালন করেন। 'নাহজুল বালাগা'র ১৯২ নং খুতবায় বর্ণিত হয়েছে যে হযরত আলী স্বয়ং এভাবেই তাঁর সেই সৌভাগ্যধন্য শৈশবের স্মৃতিচারণ করেছেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে আমার শৈশবের প্রারম্ভ থেকেই নিজের কোলে পিঠে করে লালন পালন করেছেন এবং প্রত্যেকদিনই তিনি জ্ঞান ও চরিত্রের একটি করে দরজা আমার সামনে খুলে দিতেন আর আমাকে তা মেনে চলতে নির্দেশ দিতেন।'

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (কা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

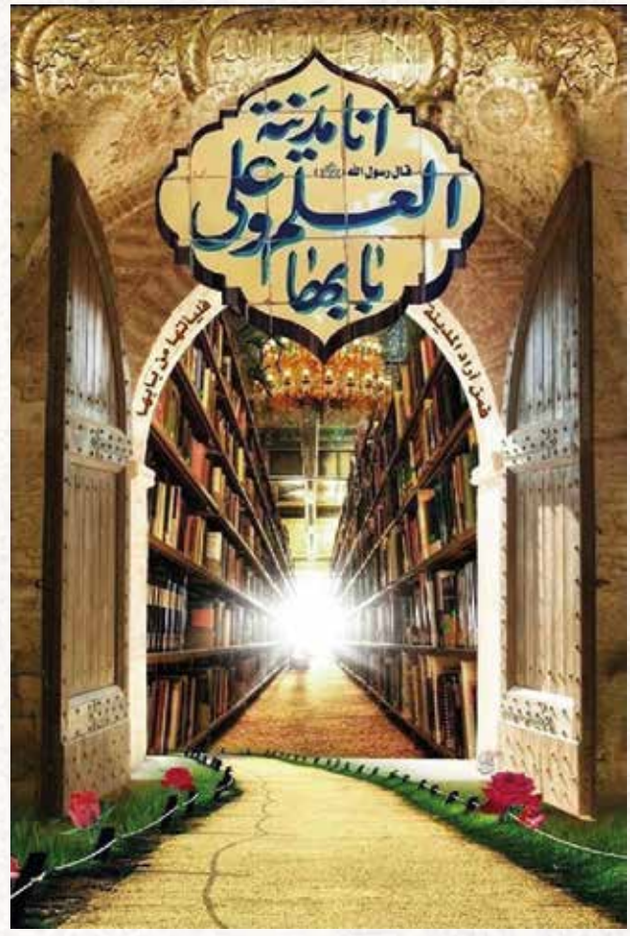

নিজের হাতে গড়া পূর্ণ ইসলামের এবং পূর্ণ ঈমানের মূর্তমান প্রতীক। অনেকে তাঁকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আল-কুরআনের পরে দ্বিতীয় চিরন্তন মু'জিজা হিসাবেও আখ্যায়িত করেন। বরং কারও কারও ভাষায় তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন। কুরআনের সাথে হযরত আলীর এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'নাহজুল বালাগা'য় বর্ণিত তাঁর ১৫৮ নং খুতবার ভাষ্য থেকে। তিনি বলেন :

ذلک القرآن فاستنطقوه ولنْ ينطق ولكن أُخبركم عنه ألا إنّ فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى و دواء دائكم ونظم ما بينكم.

: 'এই হলো কোরআন। তোমরা কোরআনকে কথা বলাও। কখনও সে কথা বলবে না। কিন্তু আমি হলাম কোরআনের মুখপাত্র। এর মধ্যের সববিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবগত করব। জেনে রেখো! এই কোরআনের মধ্যে ভবিষ্যতের জ্ঞান রয়েছে, রয়েছে অতীতের

কথাও। তোমাদের সমস্ত বেদনার উপশম আর সুষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা বিধৃত রয়েছে এর মধ্যে।'

একইভাবে 'নাহজুল বালাগা'র ১৭৫ নং খুতবায় তিনি বলেন :

والله لو شئتُ أن أُخبر كلّ رجلٍ منكم بمخْرجه ومؤلجه وجميع شأنه لفعلتُ! ولكن أخاف أن تكفروا فيّ برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ألا وإنّي مُفْضيه إلى الخاصّة ممّن يؤمّن ذلك منه.

: 'আল্লাহ্‌র শপথ! যদি চাইতাম তোমাদের সকলের জীবনের সূচনা ও পরিণতি আর তোমাদের প্রবেশ বাহির সম্পর্কে খবর জানাতে, আমি তা পারতাম! কিন্তু ভয় হয় পাছে তোমরা আমাকে নিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হও কিনা এই কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যা বলেননি, আলী তা বলছে। জেনে রেখো, আমি বিশেষ কিছু আস্থাভাজন ব্যক্তির কাছে এই জগতের কিছু কিছু রহস্য জ্ঞান প্রকাশ করি।'

হযরত আলী (কা.) এভাবে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। এই জ্ঞানের পরিমাত্রা সম্পর্কে ইশারা করে তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জ্ঞানের এক হাজারটি দরজা শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে আবার এক হাজারটি করে জ্ঞানের দরজা খুলে যায়।' *নাহজুল বালাগায়* বর্ণিত ৩ নং খুতবায় হযরত আলী বলেন : '[আমার জ্ঞানের পাহাড় এতই উঁচু যে] আমার থেকে শুধু জ্ঞানের ঢল নামে এবং কোনো পাখিই আমার চুঁড়ায় পৌঁছতে পারে না।'

তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে উদাত্ত ঘোষণা দিতেন : 'তোমরা আমাকে হারানোর আগে আমার কাছ থেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও। আমি জমিনের পথঘাটের চাইতে আসমানের পথঘাটের খবর বেশি রাখি।' (নাহজুল বালাগা : খুতবা ১৮৯)

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে-গড়া এই শিষ্যের ব্যাপারে উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন : 'আমি সমস্ত জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরজা। কাজেই যে নগরে প্রবেশ করতে চায় সে যেন এর দরজা দিয়েই প্রবেশ করে।' মহিউদ্দিন আল-আরাবী তাঁর 'রিসালাতুল কুদ্‌স' এর মধ্যে হযরত আলী (কা.)-এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : 'এই হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালিব, সেই ব্যক্তি যিনি হচ্ছেন নববী জ্ঞান-নগরীর দরজা এবং ঐ নগরীর রহস্যকথার মালিক ও ইমাম।' (রিসালাতুল কুদ্‌স : ৩৭; আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়্যা: ৮/১০৭)

আল্লামা সিবত ইবনে জাওযি হযরত আলী (কা.)-এর জ্ঞানের বিষয়ে লিখেছেন : "...তাঁকে আল-বাত্বীন নামে আখ্যায়িত করা হতো। কেননা, তিনি ছিলেন জ্ঞানের গভীরতায় পরিপূর্ণ। আর তিনি (আ.) বলতেন : 'যদি আমার জন্য একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে একটি উটের পিঠে যতটা বহন করা যায় ততটা পরিমাণ কেবল 'বিসমিল্লাহ'র তাফসিরে বক্তব্য রাখতাম।' আর তাঁকে 'আল-আনযা' বলে আখ্যায়িত করা হতো। কারণ, তিনি ছিলেন শির্‌ক থেকে বিমুক্ত।" (তাযকিরাতুল খাওয়াস : ১৬)

বিখ্যাত খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদ নিভিসিয়ান যেন হযরত আলী (কা.)-এর আফসোসকে লক্ষ্য করেই বলেন : 'যদি আলী ইবনে আবি তালিব, এই শক্তিমান ও বাগ্মী ব্যক্তি বর্তমান যুগেও কুফার মিম্বারে বসতেন তাহলে আপনারা দেখতে পেতেন মসজিদে কুফা ঐ বিশাল বিস্তৃতির পরও পাশ্চাত্য ও গোটা বিশ্ব থেকে কিভাবে বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা আলীর উত্তাল জ্ঞানের দরিয়ায় অবগাহন করার জন্য ভিড় জমাতেন।' (উদ্ধৃত: আবদুল ফাত্তাহ আবদুল মাকসুদ রচিত আল ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) : ১/১৫)

আল্লামা মুহাম্মাদ তালহা আল-শাফেয়ী হযরত আলীর ফযিলত সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আরব কবির পথনির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বলেন : عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدى : যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে তার সঙ্গীকেই প্রশ্ন কর। তাকে প্রশ্ন করো না। কারণ, প্রত্যেক সহচর তার সঙ্গীর কর্ম ও আচরণের অনুকরণ করে থাকে। অতঃপর তিনি হযরত আলীর সঙ্গী ও সহবৎ সম্পর্কে বলেন: 'দিগন্তে দিগন্তে যে নবুওয়াতের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছিল, মহান আল্লাহ তা থেকে তাঁর [আলীর] মধ্যে বিকিরণ ঘটান এবং তাঁকে এক পূতপবিত্র প্রাণ দান করেন। আর তাঁর আপন সত্তায় যে নির্মলতা ও নিষ্কলুতা বিদ্যমান ছিল একারণে আল্লাহ তাঁর মধ্যে সমস্ত মানবিক ও নৈতিক সদগুণ ধারণ করার যোগ্যতা প্রদান করেন। এরূপ এক শুদ্ধাচারী মানবসত্তার অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনি সকল পঙ্কিলতা, কুফ্‌রি, অশুদ্ধতা ও অসূচিতা থেকে পবিত্র থাকেন। শির্‌ক, পাপাচারিতা, মিথ্যা, নিফাক কোনো কিছুই তাঁর সে বিশুদ্ধতায় আঁচড় কাটতে পারেনি। আর একারণেই তিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং মূর্তি ও প্রতিমাগুলো গুড়িয়ে দিয়ে মসজিদুল হারামকে বাতিল সব খোদা এবং শির্‌ক ও গোমরাহির চিহ্নসমূহ অপসারণে অনুপ্রাণিত হন। আর এ কারণেই তাঁকে আনযা' [অর্থাৎ শির্‌ক থেকে বিমুক্ত] আখ্যায়িত করা হয়...।'

এ প্রসঙ্গে লেবাননের বিখ্যাত খ্রিস্টান লেখক ও কবি George Jordac এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : 'আমার মতে ইবনে আবি তালিব ছিলেন প্রথম আরব পুরুষ, যিনি রুহে কুল্লি তথা সামগ্রিক আত্মার সাথে সহচর ও সহবতে ছিলেন। আলী তাঁর আযামতের কারণেই শহীদ হন।' (দ্য ভয়েস অব হিউম্যান জাস্টিস : ৪৬৭)

আল্লামা মুহাম্মাদ তালহা আল-শাফেয়ী আরও বলেন : ...রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের কারণে আল্লাহ অবিরত তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিতেন। এই জ্ঞানের প্রাচুর্য এতটাই বৃদ্ধি লাভ করে যে তিরমিযী শরীফের সহিহ হাদিসের ভাষ্য মোতাবিক স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীর ব্যাপারে ঘোষণা করেন : 'আমি সমস্ত জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দরজা।' এই অসামান্য জ্ঞান দ্বারা তিনি বাদি-বিবাদির জটিল সব বিচারের ন্যায্য মীমাংসা করে দিতেন আর কঠিনতম মাসলাসমূহের সঠিক ফয়সালা বলে দিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর কোনো না কোনো অবদান চোখে পড়বে... আর যেহেতু আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও হিকমত দান করেছিলেন, একারণে সকলের কাছে সেটা প্রকাশ হয়ে যায় এবং তাকে 'বাত্বিন' নামে আখ্যায়িত করে। বাত্বিন বলা হয় তাকে যার পেট মোটা থাকে। কিন্তু হযরত আলীর ভিতরে নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিকমতের অপূর্ব সমাহার ঘটেছিল একারণে তাঁকেও 'বাত্বিন' আখ্যা দেওয়া হতো। জড় খাদ্যদ্রব্যে নয়, অজড় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর হিকমতেই তাঁর পেট পরিপূর্ণ। (মাতালিব আস-সাউল : ৭০-৭৬)

সুতরাং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট যে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (কা.) অফুরান ও বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যা নির্ঝরিণী ঝরনাধারার মতো শুধু প্রবহমাণ ছিল নিরন্তর। বিখ্যাত মুসলিম গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি বলেন: '[জ্ঞানের দিক থেকে] তিনি ছিলেন এমন এক সদা প্রবহমাণ ঝরনাধারা, সকল পণ্ডিত তাঁদের জ্ঞানসূত্রকে তাঁর সাথেই যুক্ত করতেন।' (তাজরিদ আল-ই'তিকাদ) তিনি সেই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু প্রজ্ঞা জ্ঞান

মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় এবং উপকারী হওয়ায় এবং তাদের বোধগম্যতার সাধ্যের মধ্যে থাকায় প্রকাশ করেছিলেন। আর কিছু গোপন রেখে যান, যাতে সত্যান্বেষী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা সেগুলো খুঁজে পায়।

'নাহজুল বালাগা'র ২২১ নং খুতবাটি শুরু হয় এই বাক্যটি দিয়ে : يَا لَهُ مَراماً مَا أَبْعَدَهُ، وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَهُ، وَ خَطَراً مَا أَفْظَعَهُ : 'হায়! গন্তব্য কতই না দূর! অথচ পথিকরা কতই না বে-খবর! আর কাজ কতই না দুষ্কর!' আর খুতবার শেষাংশে বলেন : وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ الدُّنْيَا .:নিশ্চয় মৃত্যুতে রয়েছে অনেক বিষম যন্ত্রণা, যা বলে বুঝাবার নয় কিংবা দুনিয়াবাসীর আক্‌ল দ্বারা তা পরিমাপযোগ্য নয়।'

আসলে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা মৃত্যুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা রাখেন না। হযরত আলী (কা.) আলোচ্য খুতবার মধ্যে একটি বাক্যে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন: لَا يَتَعَارَفُونَ لِلَيْلٍ صَبَاحاً وَ لَا لِنَهَارٍ مَسَاءً أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً : '.. এরা এক জায়গায় সমবেত হয়েছে বটে কিন্তু নিঃসঙ্গ। একে অপরের বন্ধু বটে কিন্তু পরস্পর থেকে দূরে। এরা রাতের জন্য কোনো ভোর চেনে না, তদ্রূপ দিনের জন্যও চেনে না কোনো সন্ধ্যা। এরা দিনের বেলায় মৃত্যুর সফরে গিয়ে থাকুক আর রাতের বেলায়ই গিয়ে থাকুক এ সফরই তাদের চিরন্তন যাত্রা।'

এই বাক্যটি 'নাহজুল বালাগা'র মধ্যে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট বাক্য হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এবং যাঁরা 'নাহজুল বালাগা'র শরাহ তথা ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা এই ব্যাক্যটির ব্যাখ্যা করার অনেক প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু হযরত আলী (আ.)-এর কথার মর্মার্থ উদ্ধার করা কঠিন।

ইবনে আবিল হাদিদ বলেন : 'সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি যার নামে গোটা উম্মত কসম করে থাকে, আমি এই খুতবাটি বিগত পঞ্চাশ বছরে এক হাজারেরও বেশি বার পাঠ করেছি এবং প্রত্যেকবার যখন পাঠ করতাম আমার কাছে নতুন মনে হতো। নতুন কোনো কথা এবং নতুন কোনো উপদেশ আমার কলবের মধ্যে জেগে উঠত।' (নাহজুল বালাগা, খুতবা ২৩০)

ইসলামের মহান মনীষী ও দার্শনিক ইবনে সিনা মি'রাজ এর উপরে একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন যা 'রিসালাতুল মি'রাজিয়্যা' নামে পরিচিত। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : সাহাবিদের মধ্যে হযরত আলী (আ.)-এর স্থান ছিল ইন্দ্রিয়সমূহের মাঝে আক্‌লের ন্যায় كَالْمعقول بِيْن الْحُسوس । রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে বলেন : يا على إذا تَقرّب الناس إلى الله بأنواع البِرّ، تقرّب إليه أنت بِالعقل، تَسبقهم : 'হে আলী! লোকেরা যখন নানা পুণ্যকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করে তুমি তখন আক্‌লের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করো। তাহলে তুমি তাদের আগে পৌঁছে যাবে।'

ইবনে সিনা'র এই বক্তব্যের ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন : সাহাবিদের মাঝে আলী (আ.) ছিলেন আক্‌ল, আর অন্যরা ইন্দ্রিয়সম। ইন্দ্রিয়সমূহ আকলের মুখাপেক্ষী, আর আক্‌ল সেগুলোর পরিচালক ও নির্দেশক। আলী হলেন সাহাবিদের মধ্যে সেই পথনির্দেশক আর সাহাবিগণ তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। (দ্র. হাশিয়া-ই শিফা)

গ্রন্থসূত্র:

১. নাহজুল বালাগা, সাইয়্যেদ রাজি সংকলিত এবং ইবনে আবিল হাদিদ মু'তাযেলি কর্তৃক শরাহকৃত।

২. আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্য, রিসালাতুল কুদ্‌স, মহিউদ্দিন ইবনে আরাবি।

৩. তাযকিরাতুল খাওয়াস, সিবত ইবনে জওযি।

৪. আল-ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.), আবদুল ফাত্তাহ আবদুল মাকসুদ।

৫. The Voice of Human Justice by George Jordac

৬. মাতালিব আল-সাউল, মুহাম্মদ ইবনে তালহা আল-শাফেয়ী।

৭. তাজরিদ আল-ই'তিকাদ, খাজা নাসিরুদ্দিন তুসি।

৮. আল শিফা (হাশিয়া), ইবনে সিনা।